বাংলায় অনূদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত

লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রসঙ্গ :

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়। এটি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত একটি অংশ মাত্র। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধের লগ্ন সমাসন্ন, যুদ্ধারম্ভসূচক উভয় পক্ষের শঙ্খধ্বনিও হয়ে গেছে। অসংখ্য শঙ্খ, ভেরি ঢাক, মৃদঙ্গ ও রণশিঙা বাজছে। এমন সময় অর্জুন, কাদের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে তা নির্ণয় করার জন্যে, এবং দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বী বীরপুরুষদের পর্যবেক্ষণ করার জন্যে সারথি কৃষ্ণকে উভয়পক্ষীয় সেনাদলের মধ্যে তাঁর রথ স্থাপন করতে বললেন। অর্জুনের ইচ্ছা অনুযায়ী কৃষ্ণ উভয় সেনাবাহিনীর মধ্যে তাঁর রথকে এনে উপস্থিত করলেন। কৌরব- পক্ষের পুরোভাগে অর্জুন দেখলেন পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, জ্ঞাতিভ্রাতা দুর্যোধনাদিকে। আত্মীয় ও গুরুহত্যা করে রাজ্যলাভ করতে তাঁর মন চাইল না। তাঁর শরীর অবশ হয়ে গেল, রথের উপর বসে পড়লেন অর্জুন, হাত থেকে ধনুর্বাণ খসে পড়ল। তিনি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন —কর্তব্য কী ? এই প্রশ্নে কৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, নিষ্কাম কর্মযোগ, ঈশ্বরে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ইত্যাদি বিষয়ে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, সেটিই হল গীতার উপজীব্য। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যে কৃষ্ণ অর্জুনকে সুদীর্ঘ উপদেশ দেওয়ার অবসর পেয়েছিলেন বা সেইরূপ অবস্থায় তা দেওয়া স্বাভাবিক ছিল, এটা মনে হয় না। এমন কোনও যুদ্ধ কল্পনাও করা যায় না যাতে যোদ্ধারা এমন আশ্চর্য ধৈর্যশীল এবং সুদীর্ঘ প্রতীক্ষায় রত। খুব সম্ভব কৃষ্ণের মূল উপদেশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিলো এবং পরে তাকেই ভিত্তি করে অষ্টাদশ অধ্যায়-সমন্বিত গীতাকে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যাই হোক, এটা অনস্বীকার্য যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ।

গীতা যে শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী দ্বারাই সমাদৃত তাই নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অসংখ্য মানুষ শ্রদ্ধাভরে এই গ্রন্থ পাঠ করেন। শুধু ভারতীয় সমস্ত ভাষাতেই নয়, সমগ্র পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাতেই গীতা অনূদিত হয়েছে। ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন, 'গীতা নানা কারণে অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। খ্রীষ্টধর্মে যেমন বাইবেল, ইসলামে যেমন কোরান, হিন্দুধর্মের তেমনি গীতা প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এর একটা প্রমাণ অতীতে ও বর্তমানে — এবং হয়তো ভবিষ্যতেও — ভারতবর্ষে অসংখ্য মেয়ের নাম গীতা। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে গীতা ছিল ধর্মগ্রন্থ। তাঁরা গীতা নিয়ে যেতেন ফাঁসির মঞ্চের কাছে ; শেষ-উপহার পাঠাতেন মা-বাবার কাছে। এদেশে মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে পর্যন্ত এক খণ্ড গীতা মৃতদেহের বুকে রাখা থাকে। বিচারালয়ে বন্দী-প্রতিবাদীকে সত্য কথা বলার জন্য শপথ করতে হত গীতা স্পর্শ করে। গীতা আকারে ছোট হলেও গুরুত্বে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।' (প্রথম অধ্যায় —গীতা কেন?)

'গীতা' শব্দের একটা বিশিষ্ট অর্থ আছে। আত্মজীবনে অধীত, যুগযুগান্তরব্যাপী তপস্যায় অর্জিত যে প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তা শিষ্যদের উপদেশচ্ছলে বর্ণনার নাম গীতা। অনেকে 'গীতা' বলতে শুধু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকেই বোঝেন। এটি সর্বপ্রধান ও সর্বজনপূজ্য হলেও হিন্দুশাস্ত্রে আরও অনেক গীতা আছে। শুধু মহাভারতেই তো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ছাড়া কামগীতা ও অনুগীতা নামে আরও দুটি গীতা পাওয়া যায়, এছাড়াও সংস্কৃত ভাষায় রচিত জীবন্মুক্তি-গীতা, অবধূত-গীতা, হংস-গীতা, পরাশর-গীতা, রাম-গীতা, শিব-গীতা, ভগবতী-গীতা, বৈষ্ণব-গীতা, যম-গীতা ইত্যাদি প্রায় পঁচিশটি গীতা পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল বক্তব্য একটু সংক্ষিপ্তভাবে বলে নেওয়া যায়। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'-র পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত 'গীতাতত্ত্ব'-এ বলা আছে —

উপনিষদ আলোচনা করলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন জঙ্গলের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ — তাহার শিকড় কাঁটা পাতা সমেত । আর গীতাটি কী — গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দরভাবে সাজানো —যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া। উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় এই ভক্তির কথা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে এবং এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুটিত হইয়াছে। .....পূর্বে যোগ জ্ঞান ভক্তি আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ চলিত, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা কেউ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

গীতা যখন প্রচারিত হয়, সেই যুগে সাধনার নানা পথ ছিলো। কেউ জ্ঞানসাধনা

করত, কেউ ভক্তিসাধনা, কেউ বা যোগসাধনা। গীতায় সমস্ত সাধনপন্থাকে সমন্বিত করা হলো। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ — এই চারটি পৃথক পথকে এক তত্ত্বে মিলিত করে দেওয়া হলো। সেইজন্যেই স্বামী বিবেকানন্দ গীতাকে 'ধর্মসমন্বয়শাস্ত্র' বলেছেন।

আমাদের মূল আলোচ্য অবশ্য বাংলা অনুবাদে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার স্থান নির্ধারণ। এ ব্যাপারে প্রথমেই বলা যায়, ভাষ্য ও টীকাসহ গীতার অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে সপ্তদশ শতাব্দীতে কাশীরাম দাস পদ্যে মহাভারত রচনা করেন। সেখানে ভীষ্মপর্ব লেখার সময় তিনি গীতাকে মোটামুটি বিহঙ্গদর্শনে ছুঁয়ে গিয়েছিলেন। তাহলেও যেটুকু তিনি লিখেছিলেন তাতেও বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন হয়ে গিয়েছিলো অর্থাৎ গীতার মূল সুরটি ধরা পড়েছিলো। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাশীরাম দাস বলেছেন,

'জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি যথা নব্য বস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চারে।।
শরীর বিনাশ হয় নহে জীবনাশ।
শুন কহি ধনঞ্জয় করিয়া প্রকাশ।।'

এতো গীতার অন্যতম বিখ্যাত শ্লোক --'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় / নবানি গৃহ্লাতি নরো'পরাণি .....(২/ ২২)-এর অনুরণন। আবার,

'তবে দিব্যচক্ষু কৃষ্ণ দেন অর্জুনেরে।
অর্জুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে।'

এওতো —

'ন তু মাং শক্য সে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যম্ দদামি তে চক্ষুঃপশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।' (১১/৮)

— এই শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে টীকা ও ভাষ্যসহ গীতার অনুবাদ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু কাজটি খুবই বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়ে যাচ্ছিলো। সেইজন্যই বোধ হয় তিনি গীতার আঠারোটি অধ্যায়ের অনুবাদ ও টীকা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তিনি কেবল চতুর্থ অধ্যায়ের ঊনিশ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত অনুবাদ ও টীকা কার্য সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। তাতেই প্রায় একশো পঞ্চাশ পাতার মতো আয়তন হয়েছিলো। কাজেই সমগ্র কার্যটা শেষ করতে পারলে সমগ্র গ্রন্থটি কী বিশালায়তন হতো, তা সহজেই অনুমেয়। আমাদের এবং বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

এমন প্রাঞ্জল অথচ সুবৃহৎ ও সুগভীর এমন একটা টীকাকর্ম থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

বাংলা সাহিত্যে গীতার অনুবাদ ও টীকাকর্ম কারা করেছিলেন এবং তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কেন ওই কর্মে নিযুক্ত হলেন, সে সম্বন্ধে তাঁর রচিত এই গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

'বাঙ্গালা টীকা দুই প্রকার হইতে পারে। এবং শঙ্করাদি-প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র নিজকৃত অনুবাদে কখন শঙ্কর ভাষ্যের সারাংশ, কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজকৃত অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত টীকার মর্ম্মার্থ দিয়াছেন। ইঁহাদিগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ ঋণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে শঙ্করভাষ্যের অনুবাদ থাকিবে।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত অনুবাদের সহিত "গীতাসন্দীপনী" নামে একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা দুঃখের বিষয় যে "গীতা সন্দীপনী"-তে গীতার মর্ম্ম পূর্বপণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ বুঝান হইতেছে।

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকাতেও মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টীকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই "শিক্ষিত" সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগেরই সচরাচর "শিক্ষিত" বলা হইয়া থাকে; আমি প্রচলিত প্রথার বশবর্তী হইয়াই তদর্থে "শিক্ষিত" শব্দ ব্যবহার করিতেছি। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তাপ্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায় শৈশব হইতে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুবর্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাবসকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম তাঁহাদিগকে বুঝান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।'

বঙ্কিমচন্দ্রও আনন্দগিরি-টীকা সম্বলিত শঙ্কর ভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা, রামানুজ ভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকা ইত্যাদির

প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁর টীকা প্রণয়ন করেছেন। যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র নিজে গীতার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, সেইজন্য তিনি বেদান্ত দর্শনে সুপণ্ডিত আইনজীবী হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে বাংলায় সমগ্র গীতা রচনা করতে বলেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'।

প্রথমদিকের বাংলায় গীতা অনুবাদ শুরু হয় মূল সংস্কৃত থেকে। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিই গীতা রচনা করেন সংস্কৃত থেকে ভারতীয় অন্য ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ থেকে পুনরনূদিত করে। যেমন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল গঙ্গাধর তিলকের মারাঠি ভাষায় রচিত 'গীতা রহস্যম্'-এর বাংলা অনুবাদ করেন। প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত গুজরাটি ভাষায় লেখা মহাত্মা গান্ধীর 'অনাসক্তি যোগ' বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'গীতার গান্ধীভাষ্য'। ঋষি অরবিন্দের লেখা 'Essays on the Gita' পাঠ করে গীতার দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর অনুসরণে প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা অনিলবরণ রায় বাংলা ভাষায় গীতা রচনা করেন ও শ্রীঅরবিন্দের মতো রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ করে যোগসাধনায় রত হন। পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্কৃত ভাষার মূল মহাভারতকে সংস্কৃত টীকা ও ভাষ্যসহ শ্লোকগুলির বাংলায় অনুবাদ করেন। পঁয়তাল্লিশ খণ্ডের এই সুবৃহৎ মহাগ্রন্থের মধ্যে গীতার ভাষ্য, টীকা ও অনুবাদও পড়ে। তেমনই মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ দশজন পণ্ডিতকে নিয়োগ করে সমগ্র মহাভারতকে যে পাঁচ খণ্ডে অনুবাদিত করেন, তার মধ্যেও গীতার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতা ও স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা গীতার ভাবাদর্শে (বিশেষ করে 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' এই প্রবচনে) খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে গঙ্গাধর তিলকের 'গীতারহস্যম্' খুবই অনুপ্রাণিত করেছিলো। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গীতার অনুবাদ কর্মে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'গীতায় স্বরাজ' এই তালিকায় পড়ে। এই সময় সীমায় বাংলায় গীতা রচনার বেশ একটা প্রবণতা দেখা যায়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ যেমন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, দার্শনিক, ধর্মীয় প্রচারক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ প্রমুখ এই কাজে এগিয়ে আসেন। প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে বিবেকানন্দের কথা। বিবেকানন্দ আলাদা করে গীতার ভাষ্য বা টীকা রচনা করেননি। কিন্তু গীতার মূল বক্তব্য ও তার মাহাত্ম্য তিনি নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে, ২৮শে ও ২৯শে মে তিনি সানফ্রান্সিসকোতে যথাক্রমে গীতার উপর তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, অবশ্যই ইংরাজি ভাষায়। সেগুলি 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'-র অষ্টম খণ্ডে বাংলা অনুবাদে স্থান পেয়েছে। আবার কলকাতার

আলমবাজার মঠে তাঁর অবস্থানকালে যখন কয়েকজন যুবক তাঁর কাছে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন, তখন তিনি তাঁদের ভবিষ্যতে কর্মের উপযুক্ত করার জন্য তাঁদের কাছে গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এই আলোচনাগুলি তাঁর বাণী ও রচনার পঞ্চম খণ্ডে স্থান পেয়েছে। আবার মনস্বী গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষের টীকা ও ভাষ্যসহ গীতার অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

বেশ কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি গীতার আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। তাঁরা সমগ্র গীতা পাঠ করে তার আঠারোটা অধ্যায় সম্বন্ধে অথবা সামগ্রিকভাবে গীতার আভ্যন্তরীণ দর্শন ও আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তু আলোচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠ' এই জাতীয় রচনা। কথোপকথন ও বিতর্কের মাধ্যমে গীতাচর্চাও হয়েছে এবং গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বসন্ত ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'গীতার চর্চা (বন্ধুদ্বয়ের কথোপকথন)' এই জাতীয় একটি রচনা। আবার নিজস্ব কোনও বিশেষ ভাবাদর্শ অনুসরণ না করে তার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে অতুলচন্দ্র সেনের গীতা অন্যতম। সাবলীল গদ্যে রামায়ণ ও মহাভারত রচয়িতা প্রখ্যাত সাহিত্যিক রাজশেখর বসুও গীতা অনুবাদ করেন। পরে স্বাধীনতা-উত্তর কালে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির নানা পরিবর্তনের ফলে গীতাকে নতুন নতুন দৃষ্টির আলোকে চর্চা করা শুরু হয়। এমনকি মার্কসবাদীরাও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে গীতার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। এই বর্গের একটি সুবিখ্যাত গ্রন্থ ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্যের 'গীতা কেন?'। ওই গ্রন্থে তিনি গীতার একটি বাস্তববাদী প্রতিবাদী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশ নম্বর শ্লোকটি বোধ হয় সবচেয়ে বহুচর্চিত জনপ্রিয় শ্লোক।

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গো'স্ত্ব কর্মণি।।'

[কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়। তুমি কর্মফল হেতু হয়ো না, আবার কর্মত্যাগেও তোমার প্রবৃত্তি না হোক]

অর্থাৎ কর্ম করতে হবে, কিন্তু কর্মফলে যেন আসক্তি না থাকে। এটাই গীতার সুবিখ্যাত নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব। ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে শ্লোকটির কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন দেখা যাক। 'সমাজ তখন শ্রেণী বিভক্ত। আর এ কথাটা বলছেন বৃন্দাবনের রাজপুত্র কৃষ্ণ হস্তিনাপুরের রাজপুত্র অর্জুনকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ কথাটা বলছে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোক সমাজের নীচের তলার মানুষকে। অর্থাৎ অন্যের শ্রমের ওপরে নির্ভরশীল মানুষ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই উৎপাদক শ্রমজীবী মানুষকে বলছে : পরিশ্রম কর মুখ বুজে, পারিশ্রমিকের আশা করো না, অর্থাৎ সেটা ভোগ করবে সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত শ্রেণীর মানুষেরা। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে সামাজিক বিভাগ তার কুফলের প্রকৃতি এই

শ্লোকে বোধ হয় প্রথমবার উচ্চারিত, যে উচ্চারণ আজও সর্বত্রই ঘটে চলে। পৃথিবীর যে বোধ শ্রমজীবী মানুষকে নীচে নামিয়ে রেখে বলে, তোমাদের অধিকার শুধু কাজে, কর্মফলে নয়। ওটা ভোগ করার দায়িত্ব আমরাই নিয়েছি, আমরা যারা নিজেরা পরিশ্রম করি না, তোমাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করি মাত্র। ওই গ্রন্থেরই পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, 'শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ধনিকের স্বার্থ সংরক্ষণে এ সব কথা যে কত মূল্যবান ছিল, কাজেই কত যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তা বোঝাই যায়। আজও গীতার মধ্যে এই শ্লোকটিই সবচেয়ে বেশি মুখে মুখে ঘোরে এবং হয়ত সবচেয়ে জনপ্রিয়।' গীতার নবম অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলেছেন, যে শুভবুদ্ধি নিষ্কাম ভক্ত তাঁকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, তিনি তার সেই ভক্তিপূত উপহার প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেন। আরও উদার হয়ে ও দয়া দেখিয়ে কৃষ্ণ বললেন, যে চণ্ডালাদি পাপযোনিসম্ভূত ব্যক্তিগণ, স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রগণও তাঁকে আশ্রয় করে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর 'গীতা কেন?' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন, 'তখন উত্তর ভারতে বহু পদ্ধতির পূজা চালু ছিল বহু দেবতার উদ্দেশে। এ গুলির মূল নৈবেদ্য ও বিভিন্ন বিচিত্র বিগ্রহ, পূজা প্রণালী পৃথক। এ জন্য কৃষ্ণকে বেছে নিতে হল লঘিষ্ঠ গুণিতকটিকে : ফল, ফুল ও জল, যা দরিদ্রতম পূজারীও সহজে আনতে পারে। না হলে বহু বিচিত্র পদ্ধতি ও উপকরণের আড়ম্বরে দরিদ্র সাধারণ মানুষ প্রবেশ পথ পায় না। এই তিন উপকরণ অতি সহজেই পাওয়া যায়। ফলে পূজার বিস্তার সহজ ও ব্যাপক হয়। .....স্পষ্টই বোঝা যায় সর্বজনগ্রাহ্য এক উপাসনা তার দীনতম নৈবেদ্য ও ক্ষীণতম আয়োজনকে কৃষ্ণের কাছে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য এই সব অতি সাধারণ উপাদান বস্তু ও পূজাপ্রণালীকে গ্রহণযোগ্য করলে তদানীন্তন উত্তর ভারতের ভক্তদের একটা প্রকাণ্ড জটিল সমস্যার সমাধান হল। কারণ বহুবিধ বিচিত্র প্রণালী ও উপাদানের মধ্যে নির্বাচন করার দায়িত্ব থেকে ভক্ত নিষ্কৃতি পেল। বিচিত্র সব পূজাপদ্ধতিও কৃষ্ণ সমর্থিত বলে বৈধতা পেল। ডঃ ভট্টাচার্যের মতে নারী, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষ সম্বন্ধে কৃষ্ণের মন্তব্যের মধ্য দিয়ে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রকাশ দেখা যায়। আর গীতার একাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণের অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করানোর ঘটনাকে ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য বেশ রূঢ় ও বাস্তববাদী ভাষায় বলেছেন জাদুবিদ্যা প্রদর্শন।

ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্যের 'গীতা কেন?' গ্রন্থটা নিয়ে আরও আলোচনা করা যেতে পারত, কিন্তু লোভ সংবরণ করতে হচ্ছে, কারণ প্রবন্ধটা বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে। আধুনিক যুগের অন্যতম প্রতিভাশালী কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে পদ্যে গীতার অনুবাদ শুরু করেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই তিনিও তাঁর কার্য শেষ করে যেতে পারেননি, মাত্র ছয়টা অধ্যায় রচনা করেছিলেন। বাংলা

কাব্যের জগৎ একটা বড় সম্পদ থেকে আংশিকভাবে বঞ্চিত হল।

ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ইসকন, গৌড়ীয় মঠ ইত্যাদি বাংলায় গীতা রচনায় একটা বিরাট অংশ গ্রহণ করেছে। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত অন্তত ছয়/সাতটি গীতার ভাষ্যসমেত অনুবাদ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমার প্রিয়তম গ্রন্থ। যাঁরা গীতা সম্বন্ধে কিছু জানতে উৎসুক তাঁদের আমি প্রস্তাবনা ও ভূমিকাসমেত এই গ্রন্থটা অধ্যয়ন করতে পরামর্শ দিই। স্বামী রঙ্গনাথানন্দের ইংরাজিতে লেখা 'The Universal Message of the Gita' বাংলায় অনূদিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ISKON)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য শীল অভয়াচরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উত্তর কোলকাতার একজন খাঁটি বঙ্গসন্তান যাঁর সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের নাম অভয়চরণ দে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘের শাখা-প্রশাখা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে আছে এবং বহু আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান নরনারী এই সংঘের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। ভক্তি বেদান্তস্বামী প্রভুপাদ ইংরাজিতে 'The Bhagabadgita As It Is' নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ গীতাভাষ্য রচনা করেন। তাঁর শিষ্য শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী কর্তৃক ওই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ বাংলায় একটি বহু পঠিত গীতাভাষ্য। ভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদের আর একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা হল 'গীতার গান'। যাঁরা গীতার জটিল তত্ত্ব (ভাষ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও) বুঝতে অক্ষম, অথচ গীতার রসপিপাসু, তাঁদের পক্ষে পুস্তিকাটি খুবই উপযোগী। এমনকি সরল পদ্যছন্দে রচিত পুস্তিকাটি যে মূলানুগ, তা একটু উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারা যাবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকটি হল,

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভাবমি যুগে যুগে।'

পাঠকগণ 'গীতার গান'-এ এর অনুবাদ লক্ষ্য করুন,

'সাধুদের পরিত্রাণ অসাধুর বিনাশ।
যে করে অধর্ম তার করি সর্বনাশ।।
আর ধর্ম স্থিতি অর্থ করিতে সাধন।
যুগে যুগে আসি আমি মান সে বচন।'

(৪/১৫-১৬)

গোরক্ষপুরের গীতা প্রেস থেকে ছোট বড় মাঝারি আকৃতির সাত-আটটি গীতা প্রকাশিত হয়েছে। মূল গ্রন্থগুলি হিন্দিতে রচিত হলেও সবগুলিরই বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহদাকার একটি হল গীতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সাধক-সঞ্জীবনী ও পরিশিষ্ট সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মূল হিন্দি গ্রন্থটি রচনা করেছেন

স্বামী রামসুখদাস। এই সুবিশাল গ্রন্থটির ও অন্যান্য গীতাগুলির বেশির ভাগেরই বঙ্গানুবাদ করেছেন গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গেই বলে নেওয়া যাক বাংলা ভাষায় গীতাচর্চায় বিদুষী নারীরাও পিছিয়ে থাকেননি। স্বামী সত্যানন্দের শিষ্যা সাধনা পুরী এবং এলাহাবাদে 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' নামে স্বাধীনতা সংগ্রামের দলের প্রতিষ্ঠাত্রী সরলা দেবী চৌধুরাণীও গীতা অনুবাদ করেছিলেন। আর ঐতিহাসিক-সামাজিক-বৌদ্ধিক দৃষ্টিতে রচিত 'গীতা কেন?' গ্রন্থের রচয়িত্রী ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্যের কথা ত আগেই বলেছি।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রসঙ্গ :

এবার শ্রীমদ্ভাগবতের কথায় আসা যাক। ভারতবর্ষের অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণের চেয়ে অধিক প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অন্য কোনও পুরাণ অর্জন করতে পারেনি। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাগবত শাখার অসংখ্য অনুবর্তিগণের কাছে এই গ্রন্থ পরম শ্রদ্ধেয় ও প্রামাণ্য। আলোচ্য বিষয়ের ধারাবাহিকতা, কাব্যাংশে উৎকর্ষ এবং ভাষা, রীতি ও ছন্দের ব্যবহারে পারিপাট্য অন্যান্য পুরাণের চেয়ে একে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ভাগবতের অনুবাদ, বহু টীকাকারগণের টীকা প্রণয়ন এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তাই প্রকাশ করে। এই প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তার জন্য সর্বপ্রথম ভাগবত পুরাণই ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা ভাষায় পয়ার ছন্দে ভাগবতের কাহিনিকে প্রথম অনুবাদ করেন মালাধর বসু যিনি তৎকালীন গৌড়েশ্বরের দ্বারা 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কবি মালাধর বসু দ্বাদশ খণ্ডে সমাপ্ত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ খণ্ডকেই অনুবাদের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং কাব্যটির নাম দিয়েছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। কোনও কোনও পুথিতে কাব্যটির 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নামও পাওয়া যায়। 'মঙ্গল' কথাটির উপস্থিতিতে, মনে হয়, মালাধর বসু কৃষ্ণ-জীবনকথা নিয়ে হয়তো পাঁচালি জাতীয় কাব্য রচনার প্রাথমিক পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর কথায়,

'ভাগবত অর্থ যত পয়ার বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া ।।'

লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে পাঁচালি জাতীয় কাব্য রচনাই তাঁর মূল লক্ষ্য হলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠে ভাগবত অনুসারী শক্তিময় ও ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণের মহাকাব্যিক গৌরব-গাথা। মালাধরের গ্রন্থের মূল বিভাগ তিনটি — আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য। যথাক্রমে কৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকালীলাসমূহ এই তিন পর্বে বিন্যস্ত হয়েছে। বৃন্দাবনলীলা পর্যায়ে ভূ-ভার হরণের জন্য বিষ্ণুর মর্তে আবির্ভাব; কৃষ্ণরূপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ, যশোদা ও নন্দ কর্তৃক তাঁর প্রতিপালন, গোকুল

ত্যাগ করে সপরিবারে নন্দের বৃন্দাবনযাত্রা, কৃষ্ণ কর্তৃক বিভিন্ন অসুরের নিধন, কৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্র পূজা নিষেধ, গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা, নৌকালীলা, দানলীলা, জনৈকা গোপিনীকে পরিত্যাগ করে অক্রূরের সাথে মথুরা গমন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এইখানে একটু বলে রাখা যাক, মালাধরের মূল রচনায় 'রাধা' নামের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। কারণ বাংলাদেশে রাধাভাবের প্রচলন অনেক প্রাচীন হলেও শ্রীমদ্ভাগবতে রাধা নামের কোনও উল্লেখ নেই। মনে হয়, জনৈক গোপিনীর যে উল্লেখ আছে, সেই পরবর্তীকালে লৌকিক রাধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৌরাণিক মহিমা দান করেছে। বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে রাধা প্রেম বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে চৈতন্য যুগে। মালাধর বসু প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি এবং চৈতন্যের জন্মের বহু আগেই তাঁর কাব্য রচনা শেষ হয়ে যায়।

মথুরা পর্বে কংসবধ, ঋষি সন্দীপনীর কাছে কৃষ্ণ-বলরামের বিদ্যার্জন, জরাসন্ধ-কর্তৃক কৃষ্ণের শত্রুতা, কংসের পিতা উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসন প্রদান, উগ্রসেনের নির্দেশে কৃষ্ণের মথুরার শাসনকার্য নির্বাহ, দ্বারকাপুরী নির্মাণের জল্পনা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। দ্বারকা-লীলা পর্যায়ের উপজীব্য হল দ্বারকাপুরী নির্মাণ ও কৃষ্ণের রাজধানী স্থাপন, কালযবন বিনাশ, শিশুপাল বধ, কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বিবাহ, জাম্ববতীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ, সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ, ঊষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ, পারিজাত পুষ্পলাভের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ, জরাসন্ধ বধ, ঋষিদের অভিশাপে যদুবংশের বিনাশ। দ্বারকাপুরী ধ্বংস এবং ব্যাধের শরে আহত কৃষ্ণের দেহত্যাগ।

কাহিনী-গ্রন্থনায় দেখা যায়, মালাধর গোপী প্রসঙ্গ, রাসলীলা ইত্যাদি প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত করে কৃষ্ণের বলবীর্য প্রকাশের প্রসঙ্গগুলি সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। কাজেই কাব্য-পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে অনুবাদের দাবি সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। তাছাড়া, বিষ্ণু পুরাণ ও হরিবংশের কিছু কিছু কাহিনী এতে অনুসৃত হয়েছে। তিনি চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত লেখা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পুরাণ কথা থেকে অনেক সাহায্য নিয়েছিলেন। সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, সারানুবাদ বা ভাবানুবাদ, আর সেজন্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কবির স্বীয় ভাব ও কল্পনার মায়াঞ্জন স্পর্শে অনেকাংশে মৌলিক রচনা।

মালাধরের প্রথম পরিচয় ভক্ত হিসেবে, দ্বিতীয় পরিচয় তাঁর কবি-পরিচিতি। তাঁর কাব্যে কবিত্বময় বর্ণনা কিংবা শিল্পচাতুর্যময় প্রকাশ অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু সহজ সরল নিরলঙ্কৃত ভাষায় কৃষ্ণের ঐশীশক্তির বর্ণনাই ছিল তাঁর মুখ্য পরিকল্পনা। অবশ্য এই পরিকল্পনার জন্য তৎকালীন সমাজমানসকে অনেকাংশে দায়ী করা চলে। মুসলমান আক্রমণের প্রবল ধাক্কা প্রশমিত হলে বাঙালি নিজের প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মতো এমন একজন বলিষ্ঠ ও বীর্যবান নরোত্তমকেই

খুঁজছিল। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ঐশ্বর্য ও প্রতাপের মধ্যে বাঙালি জাতি প্রত্যক্ষ করেছিল সেই জাতীয় বীরকেই। মালাধরের কাব্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রেমের দিক অপেক্ষা ঐশ্বর্যের দিক, কৃষ্ণের লীলাময় রূপ অপেক্ষা বীর্যবন্ত রূপ। ভাগবতে এই ঐশ্বর্যমিশ্রিত লীলাই প্রধান, মালাধর সেই ভাগবতকে অনুসরণ করেছিলেন।

মালাধরের কাব্যটি এক বৈষ্ণবোচিত ভক্তিনম্র হৃদয়ের সংশ্লেষে স্নিগ্ধ মহিমায় মহিমান্বিত। বলতে পারা যায় পরবর্তীকালে রূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস প্রমুখ বৈষ্ণবীয়-তত্ত্ববেত্তা মহাজনেরা যে গৌড়ীয় দর্শনের সৌধটির কাঠামো গড়েছিলেন, যার উপরে পদাবলীকারগণ শিল্পরুচির এবং ভাবাবেগের সজ্জা-মণ্ডন বিন্যাস ইত্যাদি করেছিলেন, তারই ভিত্তিপূজা হয়েছিল মালাধরের কাব্যে। স্বয়ং চৈতন্যদেব গ্রন্থখানি প্রশংসা করেছিলেন। আর সেই কারণেই গ্রন্থটি বৈষ্ণবসমাজে অত্যন্ত সুপরিচিত হয়ে গিয়েছিল।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তাঁর অকৃত্রিম বাঙালি মনোভাব। তিনি বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকাকে বাংলাদেশের শ্যামল পরিবেশে স্থাপন করে তাকে পুরোপুরি বাংলাদেশের সামগ্রী করে তুলেছেন। বাংলার গাছপালা, ফুলপাতা, এমনকি বাংলার রীতিনীতি পর্যন্ত ব্যবহার করে বাংলাদেশের জলহাওয়ায় বৃন্দাবন-মথুরা- দ্বারকাপুরীকে নতুন করে নির্মাণ করেছেন। মালাধর বসু-বিরচিত ও শ্রীচৈতন্য প্রশংসিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বাংলাদেশের জনজীবনে শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত-কাহিনী প্রচারে সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতেই রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটিতে যদিও কৃষ্ণ ও রাধার প্রেমলীলাই মুখ্য উপজীব্য বিষয় এবং যদিও ভাগবতে রাধার কোনও উল্লেখ নেই, তবুও বলা চলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর মূল উৎসভূমি শ্রীমদ্ভাগবত। অত্যাচারী কংসের বিনাশের জন্য মর্তের মানবরূপে কৃষ্ণের আবির্ভাব — 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর জন্মখণ্ডে ভাগবতের এই উত্তরাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। তেমনই কাহিনীর শেষাংশে কংস-বিনাশের জন্য কৃষ্ণের মথুরায় যাত্রা — তাও ভাগবতী ধারণার সঙ্গে অন্বিত। আসলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পৌরাণিক ও লৌকিক এই দুই সমান্তরাল ধারায় কৃষ্ণকথা প্রবাহিত ছিল। বড়ু চণ্ডীদাস ভাগবত, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ ইত্যাদির কাহিনী-উপকরণ এবং তারই সঙ্গে প্রাকৃত অপভ্রংশ ভাষায় প্রচলিত লৌকিক কৃষ্ণকথার কিছু কিছু উপকরণ এর মধ্যে সমন্বিত করেছেন।

ভাগবতকার বলেছেন, 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' — অন্যান্য অবতার ভগবানের অংশ ও কলাস্বরূপ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। বিবেকানন্দ এই মতে বিশ্বাসী। তিনি বলেছেন,

যখন আমরা তাঁহার বিবিধ ভাবসমন্বিত চরিত্রের বিষয় আলোচনা করি, তখন কিছুমাত্র আশ্চর্য বোধ হয় না যে, তাঁহার প্রতি এরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন; অথচ তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ ছিল। .....তিনি অনাসক্তির মহৎ দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি অনেককে রাজা করিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না; সেই সমগ্র ভারতের নেতা, যাঁহার বাক্যে রাজগণ নিজ নিজ সিংহাসন ছড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং রাজা হইতে ইচ্ছা করেন নাই। (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা / পঞ্চম খণ্ড)।

আবার বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলার উপাদান নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কঠোর যুক্তিপ্রবণ ও বাস্তববাদী। তাঁর মতে ভাগবত ইত্যাদিতে বর্ণিত পৌরাণিক কথা অতিপ্রাকৃত উপন্যাসে পরিপূর্ণ। ..... ভাগবতে ঐতিহাসিক কথা কিছুই পাওয়া যায় না।' (কৃষ্ণচরিত্র --- তৃতীয় খণ্ড --- মথুরা -- দ্বারকা --- প্রথম পাতা -- পাদটীকা) সুদীর্ঘ আলোচনার পর বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে উপসংহার করেছেন, 'তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অ-মানুষ। এই প্রকার মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কিনা, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে স্থির করিবেন।' বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণের অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত কার্যাবলীর মধ্যে মানুষী শক্তিরই বিকাশ দেখেছিলেন।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল 'শ্রীমদ্ভাগবত' দ্বাদশ স্কন্ধে সমাপ্ত। আধুনিক যুগে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে ভাগবতের ব্যাখ্যা সহ পূর্ণাঙ্গ মূলানুগ অনুবাদ করেছিলেন ডঃ রাধাবিনোদ গোস্বামী। তাঁর সুবিশাল গ্রন্থটি বাইশ খণ্ডে সমাপ্ত। গৌড়ীয় মঠ থেকে প্রকাশিত ভক্তিবেদান্ত সিদ্ধান্তশাস্ত্রী রচিত ভাগবত বারো খণ্ডে সমাপ্ত। শ্যামাকান্ত তর্কশাস্ত্রী রচিত ভাগবতও অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ। কিন্তু এগুলি সবই পণ্ডিতবোধ্য। গোরক্ষপুরের গীতা প্রেস থেকে হিন্দি ভাষায় রচিত ভাগবতের বাংলা অনুবাদ সহজ সরল ভাষায় লেখা। সাধারণ পাঠকের কাছে জনপ্রিয় দুটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অনুসরণে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ISKON)-এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক ইংরাজি ভাষায় রচিত 'Krishna — The Supreme Personality of Godhead' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' বাংলা ভাষায় বহুপঠিত গ্রন্থ। অপর গ্রন্থটি হলো বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত রাধামাধব ঘোষ কর্তৃক পদ্য ছন্দে বিরচিত বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকালীলা সম্বলিত 'কৃষ্ণলীলা সারাবলী'।

তথ্য-সহায়তা—

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা — পঞ্চম ও অষ্টম খণ্ড
৪। গীতা কেন ? — ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য
৫। কৃষ্ণচরিত্র — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়